মাছচাষে মাটি ও পানির গুণাগুণ

পুকুরের পানির গুণাগুণ

প্রতিটি প্রাণীর সুন্দরভাবে বসবাসের জন্য তাদের উপযোগী স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের প্রয়োজন। মাছের বাসস্থান হচ্ছে জলাশয় এবং জীবন ধারণের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে পানি। লাভজনকভাবে মাছচাষের জন্য সেই বাসস্থান ও হাওয়া চাই স্বাস্থ্যসম্মত। মাছের খাদ্যগ্রহণ, বেঁচে থাকা, দৈহিক বৃদ্ধি, প্রজনন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক ও গুণাবলির একটি অনুকূল মাত্রা রয়েছে। জলজ পরিবেশে এসব গুণাবলির অনুকূল মাত্রা মাছচাষে কাঙ্খিত উৎপাদনে সহায়ক ভুমিকা পালন করে থাকে। জলাশয়ের উৎপাদন ক্ষমতা প্রাথমিকভাবে মাটির বিভিন্ন গুণাগুণের ওপর নির্ভর করে। উর্বর মাটিতে খনন করা পুকুরের পানি সাধারণত উর্বর হয়। উর্বর মাটি ও পানি মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরির অধিক পরিমাণে প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান দেয়। সুতরাং সফলভাবে মাছচাষে মাটি ও পানির গুণাগুণের গুরুত্ব অপরিসীম।

পুকুরের মাটি ও পানির গুণাগুণ যথাযথ মাত্রায় না হলে ঃ

- মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদন হবে না
- মাছের বৃদ্ধি আশানুরূপ হবে না
- বাহির থেকে দেয়া খাদ্যের অপচয় হবে
- মাছের উৎপাদন কম হবে
- মাছ রোগবালাইয়ে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে

জলাশয়ের পানির গুণাগুণকে দুই ভাগে ভাগ কর হয় -

১) ভৌত গুণাগুণ, ও
২) রাসায়নিক গুণাগুণ

ভৌত গুণাগুণ (Physical properties)

গভীরতা, আলো, তাপমাত্রা, ঘোলাত্ব, স্বচ্ছতা ইত্যাদি পানির ভৌত গুণাবলি।

রাসায়নিক গুণাগুণ (Chemical Properties)

পানিতে বিভিন্ন গ্যাস, খনিজ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে; যথা-অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, এ্যামোনিয়া, নাইট্রাইট, ফসফরাস, নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অম্ল, ক্ষার ইত্যাদি পানির রাসায়নিক গুণাবলি।

নিচে পানির ভৌত এবং রাসায়নিক গুণাবলি এবং মাছচাষে এগুলোর প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

পানির গভীরতা (Depth)

উষ্ণ মণ্ডলীয় অঞ্চলে গভীরতার কারণে সূর্যালোকের প্রভাবে পানিতে তিনটি স্তরের সৃষ্টি হয়, যথা- ইপিলিমনিয়ন (উপরের স্তর), থার্মোক্লাইন (মধ্য স্তর) এবং হাইপোলিমনিয়ন (নিচের স্তর)। বাংলাদেশের অধিকাংশ পুকুরগুলির গভীরতা ২-৩ মিটারের মধ্যে। ফলে হাইপোলিমনিয়ন স্তরটি দেখা যায় না। উপরের স্তরই মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক। পুকুর বেশি গভীর হলে সূর্যালোক নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না ফলে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ত উৎপাদন হয় না। এতে মাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এছাড়া পানির গভীরতা বেশি হলে পুকুরের তলদেশে তাপমাত্রা কম থাকে, অক্সিজেনের অভাব ঘটে এবং ক্ষতিকর গ্যাস সৃষ্টি হয়। অপরদিকে পুকুরের গভীরতা কম হলে পুকুরের পানি গ্রীষ্মকালে খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায়, ফলে তলদেশে ক্ষতিকর উদ্ভিদ জন্মাতে পারে। এজন্য পুকুরের পানির গভীরতা কমপক্ষে ১.৫ মিটার থেকে ৩ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। তবে দুই মিটার গভীরতা সম্পন্ন পুকুর মাছের চাষের জন্য উত্তম।

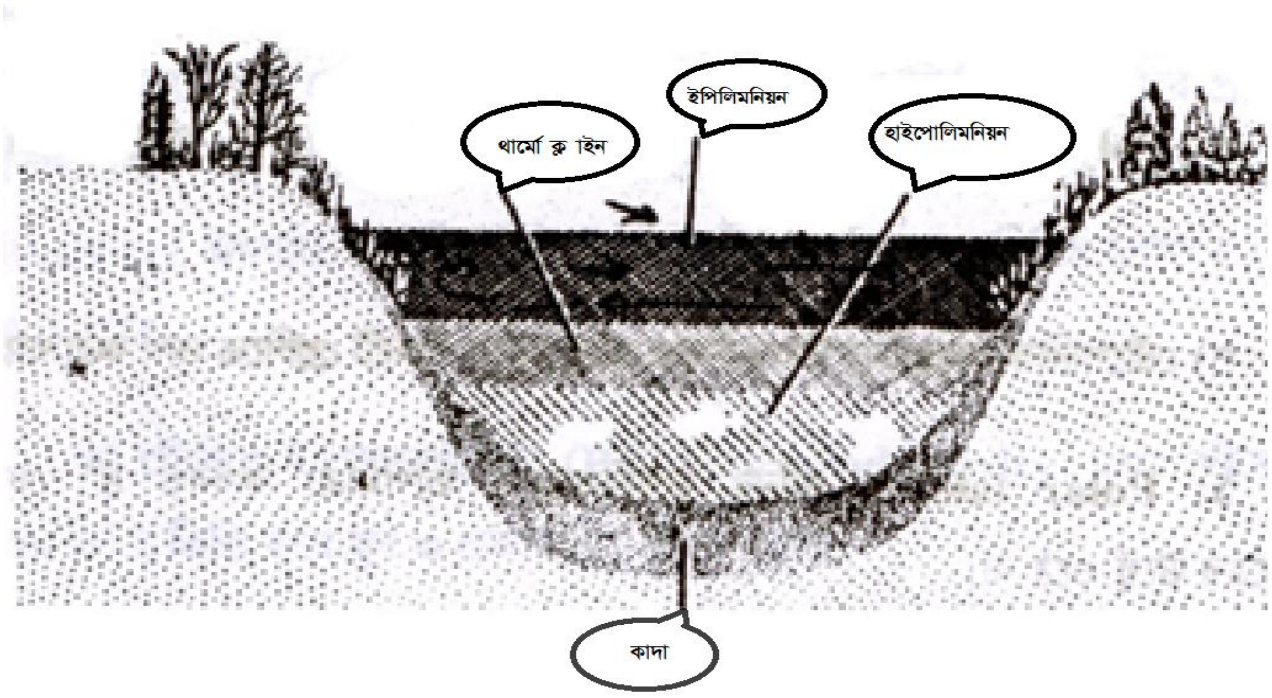

চিত্র-১: একটি গভীর পুকুরের স্তরায়ন

পুকুরের গভীরতা বেশি হলে মাছের পোনা বা চিংড়ি পিএল পানির চাপ সহ্য করতে পারে না। পোনা ও পিএল অগভীর পানিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। নার্সারি পুকুরের গভীরতা ৭৫-৯০ সে.মি. (২.৫-৩.০ ফুট) এবং মজুদ পুকুরের গভীরতা ১৫০-২০০ সে.মি. (৫.০-৭.০ ফুট) হলে ভালো হয়।

অগভীর পুকুরের তলায় আলো পড়ার দরুণ অধিক জলজ উদ্ভিদ জন্মায়, পুকুরের পানির গভীরতা ১.৫-২ মিটার রাখা হলে এ সমস্যা থাকবে না। পানির গভীরতা ঠিক রাখার জন্য পুকুরের তলায় কাঁদাযুক্ত স্তর সৃষ্টি করতে হবে। তাছাড়া শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজন পরিমান পানির গভীরতা বহাল রাখতে সেঁচের ব্যবস্থা করা হলে ভাল হয়। গভীর পুকুরের তলায় যাতে অক্সিজেনবিহীন স্তর (deoxygenated layer) সৃষ্টি হতে না পারে সেজন্য তলায় জাল বা হররা টানা অথবা এয়ারেটরের পাইপের মাধ্যমে তলায় বায়ু সঞ্চালিত করা উত্তম।

আলো (Light)

পুকুরের প্রকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের আলোর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপুর্ণ। সূর্যালোকের প্রাপ্ততা ও প্রখরতর ওপর সালোক-সংশেষণ নির্ভরশীল যা থেকে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদন ও অক্সিজেন সৃষ্টি হয়। সবুজ উদ্ভিদকণা সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সালোক সংশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে গ্লুকোজ তৈরি করে যা ফাইটোপ্লাঙ্কটনের (মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য) খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং সালোক সংশ্লেষণ চলাকালে উৎপাদিত অক্সিজেন পানিতে দ্রবীভূত হয়ে জলজ জীবকুলের শ্বাসকার্যে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়াও অনেক জলজপ্রাণী শারীরবৃত্তিক কার্যাবলী, বয়স, জীবন ইতিহাসের স্তর, ঋতু এবং অন্যান্য অবস্থার জন্য আলোর প্রতি সংবেদনশীল। পুকুরে দৈনিক কমপক্ষে ৬ -৮ঘণ্টা সূর্যালোক পড়া আবশ্যক।

পুকুরে সূর্যালোক পড়া নিশ্চিত করতে পানিতে ভাসমান আগাছা ও পাড়ের উপরে থাকা গাছের ডালপালা ছেটে রাখতে হবে।

তাপমাত্রা (Temperature)

মাছ হচ্ছে শীতল রক্ত বিশিষ্ট জলজপ্রাণী। মাছ বা চিংড়ির তাপমাত্রা সহনশীলতার একটি মাত্রা রয়েছে। পানির তাপমাত্রার সাথে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদন এবং মাছ/চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি সরাসরি সম্পর্কিত। অর্থাৎ মাছের বৃদ্ধি, প্রজনন এবং অন্যান্য জৈবিক কার্যক্রম তাপমাত্রা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পানির তাপমাত্রার সাথে পুকুরের প্রথামিক উৎপাদন এবং মাছের দৈহিক বৃদ্ধি সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। তাপমাত্রা বেড়ে গেলে জলজ প্রাণীদের বিপাকক্রিয়া বেড়ে যায়। বিপাকক্রিয়া বাড়লে প্রানিকুলের ক্ষুধাও বেড়ে যায়। এ অবস্থায় পানির পরিবেশ ভাল থাকলে মাছ বা চিংড়ি বেশি খায় এবং বাড়েও বেশি। পানির তাপমাত্রা ১ সেঃ বৃদ্ধি পেলে মাছের বিপাকীয় হার ১০% বৃদ্ধি পায়। তাপমাত্রা ১১ সেঃ নিচে হলে মাছ খুব কম খায় এবং ৯ সেঃ নিচে হলে মাছ খাওয়া বন্ধ করে দেয়। । মাছের পোনা/ পিএল উৎপাদনে সহায়ক তাপমাত্রা ২৫-৩১ সেঃ, তবে রুই জাতীয় মাছচাষের জন্য ২৮-৩০ সেঃ তাপমাত্রা উত্তম।

মড়ক এড়াতে ও গুনগত মান ভাল রাখতে মাছ ছাড়া বা ধরার কাজ তুলনামূলক ঠান্ডার সময়ে অর্থাৎ সকালে বা সন্ধায় করা উচিত। পানিতে সূর্যালোক প্রবেশের সব বাধা (ভাসমান আগাছা, ডালপালা) দূর করা হলে পানির তাপমাত্রা ভাল থাকে। ভুগর্ভস্থ পানি শীতকালে উষ্ণ ও গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা থাকে বলে পুকুরের পানির তাপমাত্রা বাড়ানো বা কমানোর মাধ্যমে সহনীয় মাত্রায় রাখার জন্য শীত-গ্রীষ্ম উভয় সময়ের জন্যই ভুগর্ভস্থ পানি সংযোজন সহায়তা করে থাকে।

ঘোলাত্ব (Turbidity)

পানিতে ভাসমান অতি সূক্ষ্ম জৈবিক ও অজৈবিক দ্রব্যাদির পরিমাপকে ঘোলাত্ব বলে। মাছচাষের ক্ষেত্রে ঘোলত্বের খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সকল জলাশয়ে পানি কিছু না কিছু ঘোলা থাকে। তবে যখন খালি চোখে ঘোলাত্ব বোঝা যায়, তখনই আমরা তাকে ঘোলা পানি বলে থাকি। ঘোলা পানি সূর্যলোকে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে, পানির প্রাথমিক উৎপাদন কমায়। অতিরিক্ত ঘোলা পানিতে মাছের শ্বাস ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে, এমনকি মাছ মারাও যেতে পারে। ঘোলা পানিতে মাছের দৃষ্টি হ্রাস পায় ফলে স্বাভাবিক চলাফেরায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

মাটির গঠন পরিবর্তন করে কাদা মাটির দ্বারা সৃষ্টি ঘোলাত্ব নিয়ন্ত্রন করা যায়। তা ছাড়া পুকুরের বাইরে পানি প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে,পাড়ে ঘাসের আবরণ সৃষ্টি করে এবং গোবর জাতীয় জৈব পদার্থ ব্যবহার করে ঘোলাত্ব নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এ ছাড়া ও চুন,জীপসাম, রাসায়নিক সার ইত্যাদি ব্যবহার করেও ঘোলাত্ব দূর করা সম্ভব।

দ্রবীভূত অক্সিজেন (Dissolved Oxygen)

জলাশয়ে দ্রবীভূত গ্যাসসমূহের মধ্যে দ্রবীভূত অক্সিজেন মাছচাষের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মাছের শ্বাস-প্রশ্বাস, খাদ্য গ্রহণ, পরিপাকসহ শারীরবৃত্তিক সকল কার্যক্রমে অক্সিজেনের প্রভাব অভাবনীয়। মাছ ও চিংড়ির জন্য অনুকূল দ্রবীভূত অক্সিজেন মাত্রা কমপক্ষে ৫-৭ পিপিএম।

পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের উৎস প্রধানতঃ দুইটি; পানি সংলগ্ন বাতাস ও বায়ু চাপ এবং সালোক-সংশেষণ। মূলত বায়ুমন্ডল থেকে পানিতে অক্সিজেন দ্রবীভূত হয়। আবার পানির ভিতরে সংঘটিত সালোক সংশেষণ প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত অক্সিজেন পানিতে অক্সিজেন দ্রবীভূত হয়। তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, বায়ুচাপ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতার সঙ্গে পানিতে অক্সিজেন দ্রবণীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। তাপমাত্রা এবং লবণাক্ততা বেড়ে গেলে পানিতে অক্সিজেনের দ্রবণীয়তা কমে যায়। ফলে তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, অন্যান্য গ্যাসের আংশিক চাপ বাড়ার সাথে সাথে পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। বায়ু চাপ বাড়লে অক্সিজেনের দ্রবনীয়তা বাড়ে ।

দ্রবীভূত অক্সিজেন হ্রাসের কারণসমূহ

১. জলজ জীব কর্তৃক শ্বসন
২. মৃত জৈব পশুর পঁচন
৩. মেঘলা আবহাওয়া
৪. ভূ- গর্ভস্থ পানির মিশ্রণ
৫. তাপমাত্রা বৃদ্ধি
৬. ঘোলাত্ব
৭. আয়রনের উপস্থিতি, ইত্যাদি।

অক্সিজেন স্বল্পতার লক্ষণ

১. মাছ পানির উপরে ভেসে আসে এবং খাবি খেতে থাকে
২. মাছ দ্রুত গতিতে সাঁতার কাটতে থাকে
৩. মৃত মাছের মুখ “হা” করা থাকে
৪. পুকুরের উপর বুদ বুদ জমা হয়
৫. পুকুরে হাঁটতে থাকলে তলা থেকে বুদ বুদ আকারে গ্যাস বের হতে থাকে।

প্রতিকার

১. পানিতে ঢেউ সৃষ্টি করে
২. প্রখর রৌদ্রজ্জ্বল সময়ে হররা টেনে তলদেশের বিষাক্ত গ্যাস বের করে
৩. এয়ারেটর বা অন্য উপায়ে পানিতে প্রচুর ঢেউ সৃষ্টি করে বাতাস - পানির সংস্পর্শ বৃদ্ধি করে
৪. নতুন পানি যোগ করে।

কার্বন ডাই অক্সাইড (Carbon dioxaide)

পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের উৎস প্রধানতঃ জৈব পদার্থের পচন ও জলজ জীবের শ্বাস প্রশ্বাস। সালোক সংশ্লেষনে কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রয়োজনীয় উপাদান। মুক্ত কার্বনঅক্সাইড ব্যতীত উদ্ভিদ কর্তৃক সালোক- সংশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদন সম্ভব নয়। কার্বনডাই অক্সাইড মুক্ত, অর্ধমুক্ত এবং বদ্ধ অবস্থায় পানিতে থাকে। জীবের শ্বসন পানিতে মুক্ত কার্বনডাই অক্সাইডের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। মাত্রাতিরিক্ত ফাইটোপাঙ্কটনের ব্লুম এবং অত্যধিক জৈব বস্তুর পঁচনের ফলেও মুক্ত কার্বনডাই অক্সাইডের বৃদ্ধি ঘটে। মৃত জৈব বস্তুর ব্যাক্টেরিয়ার পঁচন মুক্ত কার্বনডাই অক্সাইড সরবরাহ করে। পুকুরে যদি ব্যাক্টেরিয়ার পঁচনের দ্বারা প্রচুর পরিমাণ মুক্ত কার্বনডাই অক্সাইড তৈরি হয় তাহলে মাছের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড পানির পিএইচ-এর মান ৪.৫ পর্যন্ত নামাতে পারে। মুক্ত কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা হ্রাস পায়। পানিতে কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস বেশি থাকলে জলজ প্রাণীর অক্সিজেন গ্রহণ করার ক্ষমতা কমে যায়। ২০ মি.গ্রা/লিটার (২০ পিপি এম) এর নিচে মুক্ত কার্বনডাই অক্সাইড মাছ ও চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর নয়।

পুকুরে চুন প্রয়োগ করে অথবা মজুদ ঘনত্ব কমিয়ে মুক্ত কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস করা যায়। পুকুরে চুন প্রয়োগ করে মাত্রাতিরিক্ত ফাইটোপাঙ্কটনের ব্লুম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। পুকুরের তলায় অত্যধিক জৈব বস্তুর পঁচনের ফলে সৃষ্ট মুক্ত কার্বনডাই অক্সাইড জাল বা হররা টেনে দূর করা যায়।

এ্যামোনিয়া (Ammonia)

মাছ ও চিংড়ির বর্জ্য, অভুক্ত খাদ্য, বিভিন্ন নাইট্রোজেনজাত পদার্থের পঁচন এবং হঠাৎ করে ফাইটোপাঙ্কটন মারা গিয়ে পঁচনের ফলে পুকুরে এ্যামোনিয়ার সৃষ্টি হয়, যার আধিক্য মাছের জন্য ক্ষতিকর। পুকুরে এ্যামোনিয়া আয়নিত বা আয়োনাইজড (NH_4) এবং অ-আয়নিত বা আনআয়োনাইজ্ড(NH_3) এই দুই রূপে থাকে। আনআয়োনাইজ্ড(NH_3) এ্যামোনিয়া মাছ ও চিংড়ির জন্য খুব বিষাক্ত। আয়োনাইজ্ড (NH_4) এ্যামোনিয়া মাছ ও চিংড়ির জন্য কম ক্ষতিকর। তাপমাত্রা ও পিএইচ বেড়ে গেলে আনআয়োনাইজ্ড(NH_3) এ্যামোনিয়া বেড়ে যায়। পুকুরে অনায়নিত বা আনআয়োনাইজ্ড (NH_3) এ্যামোনিয়ার মাত্রা ০.০২৫মি.গ্রা/ লিটার এর বেশি হওয়া উচিত নয়। পুকুরে এ্যামোনিয়ার মাত্রা বেড়ে গেলে পানির রং তামাটে অথবা কালচে হয় এবং মাছ পাগলের মত ছোটাছুটি করে এবং চক্রাকারে দ্রুত সাঁতার কাটতে থাকে।

পুকুরে ভাল পানি সরবরাহ করে এবং মজুদ ঘনত্ব, সার ও খাদ্য প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ করে এ্যামোনিয়া নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। পুকুরের তলায় চুন প্রয়োগ করে বা এয়ারেটরের পাইপের মাধ্যমে তলায় বায়ু সঞ্চালনের মাধ্যমে ক্ষতিকর অনায়নিত এ্যামোনিয়াকে আয়নিত এ্যামোনিয়ামে পরিণত করা যায়। তলার পঁচা জৈব বস্তু খায় এমন প্রজাতি (benthos feeder) মিশ্রিত করে মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ করা হলে তলায় সবসময় বেশ নাড়াচাড়া থাকে এবং বিষাক্ত অনায়নিত এ্যামোনিয়া সহজেই আয়নিত এ্যামোনিয়ামে রুপান্তরিত হয়। উপকারী ব্যাকটেরিয়া বা প্রোবয়োটিকস প্রয়োগ এবং অক্সিজেন সমৃদ্ধ ট্যাবলেট প্রয়োগ করা হলে ক্ষতিকর অনায়নিত এ্যামোনিয়া আয়নিত এ্যামোনিয়ামে রুপান্তরিত হয়। তাছাড়া মাঝে-মধ্যে জাল বা হররা টেনেও এই উপকার পাওয়া সম্ভব।

নাইট্রাইট (Nitrite)

নাইট্রাইট হলো ব্যকটেরিয়ার দহন বা ডিকম্পোজিশনের ফলে অ্যামোনিয়া ও নাইট্রেটের একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। পুকুরের তলার পঁচা পদার্থ বেড়ে গেলে অক্সিজেনহীন অবস্থায় ব্যাকটেরিয়া নাইট্রেটকে নাইট্রাইটে পরিণত করে। নাইট্রাইটের খুব স্বল্প মাত্রাও মাছ বা চিংড়ির জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত। পানিতে নাইট্রাইটের মাত্রা ০.১ মি.গ্রা/লিটারের কম থাকা উচিৎ।

পূর্বে বর্ণিত এ্যামোনিয়ার মতই পুকুরে ভাল পানি সরবরাহ করে এবং মজুদ ঘনত্ব, সার ও খাদ্য প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ করে নাইট্রাইট নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। পুকুরের তলায় চুন প্রয়োগ করে বা এয়ারেটরের পাইপের মাধ্যমে তলায় বায়ু সঞ্চালনের মাধ্যমে ক্ষতিকর নাইট্রাইটকে নাইট্রেটে পরিণত করা যায়। তলার পঁচা জৈব বস্তু খায় এমন প্রজাতি মিশ্রিত করে মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ করা হলে তলায় সবসময় বেশ নাড়াচাড়া থাকে এবং ক্ষতিকর নাইট্রাইট সহজেই নাইট্রেটে রুপান্তরিত হয়। উপকারী ব্যাকটেরিয়া বা প্রোবয়োটিকস প্রয়োগ এবং অক্সিজেন সমৃদ্ধ ট্যাবলেট প্রয়োগ করা হলে ক্ষতিকর নাইট্রাইটকে নাইট্রেটে রুপান্তরিত করা সহজ হয়। তাছাড়া মাঝে-মধ্যে জাল বা হররা টেনেও এই উপকার পাওয়া সম্ভব।

ফসফরাস (Phosphorous)

মাটিতে সাধারণত প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস থাকে। তবে অত্যাধিক অম্ল বা ক্ষারধর্মী পানিতে ফসফরাস দ্রবীভূত হয় না। ফসফরাস পানিতে ফসফেটরুপে বিদ্যমান থাকে। পুকুরে উদ্ভিদ প্লাংকটন উৎপাদনে পরিমিত পরিমাণে ফসফেটের প্রয়োজন হয়। জৈব পদার্থের আধিক্য পানিতে ফসফরাস সরবরাহ বৃদ্ধি করে থাকে। সাধারণভাবে পুকুরের পানিতে ০.৫-১.০ পিপিএম সহজ প্রাপ্য ফসফরাস থাকা দরকার।

পুকুরে পরিমানমত কম্পোষ্ট, টিএসপি বা ডিএপি সার প্রয়োগ করে ফসফরাসের সরবরাহ ঠিক রাখতে হয়। পুকুর প্রস্তুত কালে চুন প্রয়োগ করা হলে মাটিতে থাকা জৈবযৌগ হতে ফসফেট মুক্ত হয়ে পানিতে মিশে যায়। ফলে পানি মাছের প্রাকৃতিক খাবার ফাইটোপ্লাংকটন বৃদ্ধির অনুকূল হয়ে যায়। পানিতে অত্যাধিক সার বা খাদ্য প্রয়োগ করা হলে সৃষ্ট অতিরিক্ত জৈববস্তুর পঁচনের ফলে ফসফরাস বেড়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পিএইচ দেখে নিয়ে পরিমিত চুন প্রয়োগ, পরিমাণ মত সার ও খাদ্য প্রয়োগ, তলার অতিরিক্ত পঁচা কাঁদা অপসারণ করা এবং জাল বা হররা টানায় উপকার পাওয়া যায়।

নাইট্রোজেন (Nitrogen)

বায়ুমন্ডল নাইট্রোজেনের প্রধান উৎস। উদ্ভিদ নাইট্রোজেনকে নাইট্রাইট অবস্থায় রূপান্তরিত করে থাকে। বিদ্যুৎ চমকানোর দ্বারা বায়ুমন্ডলের নাইট্রোজেন নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়। নাইট্রোজেন ফিক্সিং ব্যাকটেরিয়া যেমন-*Azotobacter, Rhizobium, Anabaena, Rhodosprillum* ইত্যাদি বায়ুমন্ডলের মুক্ত নাইট্রোজেনকে নাইট্রেটে রূপান্তরিত করে। আবার জৈবিক পদার্থ পঁচে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তিতে হয়ে নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়। নাইট্রোজেন জলজ উদ্ভিদের মৌল উপাদান। এ উপাদানটি আমিষ সংশ্লেষণের গুরুত্বপূর্ণ একটি উপকরণ। তাই নাইট্রোজেন উপাদানটি জলজ উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উদ্ভিদ প্লাংকটন বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী উপাদান (*Limiting bacter*) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশেষ করে পুষ্টিসাধক বস্তু নাইট্রেট নাইট্রোজেন ক্লোরোফিল উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য উপাদান। পানিতে ২-৪ পিপিএম নাইট্রোজেন মাত্রা মাছ চাষের জন্য ভাল। কিন্তু সামন্য পরিমাণ (০.১মি.গ্রা/লি.) নাইট্রাইটও ভাল নয়।

প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন কোন বড় জলাশয়ের নাইট্রোজেন চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। তাই ইউরিয়া সার প্রয়োগ করে পানিতে নাইট্রোজেন চাহিদা মেটানো যায়। নাইট্রেজেন ফিক্সিং ব্যাকটেরিয়া (*Azotobacter, Rhizobium, Anabaena, Rhodosprillum* ইত্যাদি), নাইট্রাইটকে নাইট্রেটে রুপান্তরকারী ব্যাকটেরিয়া (*Nitrobacter)* প্রয়োগ ও ব্যবহার করে উপকারী নাইট্রেট নাইট্রোজেন বৃদ্ধি ও ক্ষতিকর নাইট্রাইট নাইট্রোজেন হ্রাস করা সম্ভব।

পিএইচ (pH)

পিএইচ হচ্ছে কোন বস্তুর অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের মাত্রার পরিমাপক। পানির পিএইচ বলতে পানির অম্লীয় বা ক্ষারীয় বা নিরপেক্ষ অবস্থা বোঝায়। যা ১ হতে ১৪ পর্যন্ত বিস্তৃত। পিএইচ ৭ দ্বারা নিরপেক্ষ মান বোঝায় এবং ৭ এর নিচে এবং উপরে যথাক্রমে অম্লীয় এবং ক্ষারীয় অবস্থা নির্দেশ করে। মাছ চাষে পিএইচ এর মান জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মাছ চাষের ক্ষেত্রে সাধারণত পানির পিএইচ ৬.৫-৮.৫ এর মধ্যে থাকা সবচেয়ে ভাল। পিএইচ- এর মান ৪ এর নিচে এবং ১১ এর উপরে হলে অধিকাংশ মাছের জন্য তা মারাত্মক। পানির পিএইচ ১১ হলে বা ৪.০ নিচে হলে মাছ মারা যায় এবং ৬.৫ এর কম হলে মাছের বৃদ্ধি কমে যায়। পিএইচ-এর মান ১১ এর উপর হলে মাছের বৃদ্ধি এবং শারীরবৃত্তিক কর্মকান্ড হ্রাস পায়। পানির পিএইচ বেড়ে গেলে মাছের ফুলকা নষ্ট হয়, চোখের কর্নিয়া এবং লেন্স নষ্ট হয়, অসমোরেগুলেশন ক্ষমতা হ্রাস পায়, মাছ ও চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়। পানির পিএইচ ৯.০ এর বেশি হলে এবং তা দীর্ঘ স্থায়ী হলে মাছের খাদ্য চাহিদা কমে যায় এবং মাছের বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। অম্লত্ব বাড়লেও মাছের খাদ্য চাহিদা কমে যায়।

পানি অম্লীয় হলে তাতে চুন প্রয়োগ করে এবং ক্ষারধর্মী হলে তাতে অ্যামোনিয়াম সালফেট বা তেঁতুল গোলানো পানি প্রয়োগ করে পানির পিএইচ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সাধারণত চুন প্রয়োগ করেই পানির পিএইচ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অম্লীয় পানিকে চুন প্রয়োগের দ্বারা চাষানুকূল করার পর সার প্রয়োগ করতে হয়। মিঠে পানির সরবরাহ বাড়ানো হলে পানির অধিক ক্ষারত্ব বা অম্লতের যেকোন অবস্থা কমে যায়।

অম্লীয় পানির প্রভাব

- পিএইচ-এর মান ৫ এর নিচে থাকলে অভিস্রবণের মাধ্যমে মাছের দেহের রক্ত থেকে সোডিয়াম ও ক্লোরাইড বেরিয়ে যায়। ফলে দুর্বল হয়ে মাছ মারা যায়। পানিতে ক্যালসিয়াম কম থাকলে এ ক্ষতি আরও মারাত্মক আকার ধরণ করে।
- শরীর থেকে প্রচুর বিজল (Mucous) বের হয় এবং ফুলকা আক্রান্ত হয়।
- মাছ ও চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, খাবার রুচি কমে যায়, আঘাতপ্রাপ্ত হলে ঘা সহজে সারে না।
- বড় মাছের চেয়ে রেণু ও পোনা দ্রুত আক্রান্ত হয়।

ক্ষারীয় পানির প্রভাব

পিএইচ মান ১১-এর উপরে চলে গেলে মাছ দ্রুত মারা যায়। পিএইচ বেড়ে গেলে-

- ফুলকা নষ্ট হয়ে যায়
- চোখের লেন্স এবং কর্ণিয়া নষ্ট হয়ে যায়
- পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পায়
- অস্মোরেগুলেশন (Osmoregulation) ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে মাছ দুর্বল হয়ে মারা যায়।
- মাছ ও চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও খাবারের রুচি কমে যায়।
- প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়।

পিএইচ নিয়ন্ত্রণ

পানি অম্লীয় হলে তাতে চুন প্রয়োগ করে এবং ক্ষারধর্মী হলে তাতে অ্যামোনিয়াম সালফেট বা তেঁতুল গোলানো পানি প্রয়োগ করে পানির পিএইচ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সাধারণত চুন প্রয়োগ করেই পানির পিএইচ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অম্লীয় পানিকে চুন প্রয়োগের দ্বারা চাষানুকূল করার পর সার প্রয়োগ করতে হয়। মিঠে পানির সরবরাহ বাড়ানো হলে পানির অধিক ক্ষারত্ব বা অম্লতের যেকোন অবস্থা কমে যায়।

ক্ষারত্ব ও খরতা (Alkalinity and Hardness)

পানিতে উপস্থিত কার্বনেট, বাই-কার্বনেটের ঘনত্বই ক্ষারত্ব (Alkalinity) এবং ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম এর যৌথ ঘনত্বই হচ্ছে খরতা (Hardness)। মাছ বা চিংড়ি চাষের জন্য হালকা খর পানি সবচেয়ে ভাল। পানির ক্ষারত্ব ও খরতার মান ২০ মি.গ্রা./লি. এর কম বা খুব বেশি বেড়ে গেলে পানির বাফারিং ক্ষমতা কমে যায়, প্রাথমিক উৎপাদন কমে যায়, সারের কার্যকারিতা কমে, মাছ/ চিংড়ি সহজেই অম্লত্ব ও অন্যান্য বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়। ক্ষারত্ব ও খরতার মান ৪০-২০০ মি.গ্রা./লি. হওয়া উচিত।

সাধারণত পানিতে বিদ্যমান ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের মোট ঘনত্ব দ্বারা খরতা পারমাপ করা হয়, যা আরো সহজে প্রকাশ করা হয় ($CaCo_3$) এর পরিমাণ দিয়ে। মোট খরতার পরিমাণ মোট ক্ষারত্বের সাথে সম্পর্কিত।

খর পানির শ্রেণীবিন্যাস

খরতার ক্ষারত্বের অনুযায়ী পানিকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

পানির ধরন	**খরতার মাত্রা (পিপিএম)**
মৃদু পানি	০-৭৫
হালকা খর পানি	৭৫-১৫০
খর পানি	১৫০-৩০০
অতি খর পানি	<৩০০

বাংলাদেশের মাটি ও পানির খরতার ধরণ

খরতার পরিমাণ নির্ভর করে এলাকাগত ভূ-তাত্ত্বিক গঠন ও বৈশিষ্ট্যের উপর। বাংলাদেশের এলাকাগত মাটির গুণাগুণ অনুযায়ী পানির খরতা কম বা বেশি হয়। যেমনঃ

১. বেশিমাত্রায় খরতা ও ক্ষারত্ব অঞ্চল ঃ রাজশাহী বিভাগের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল (নাটোর, বগুড়া, নওগাঁ), খুলনা বিভাগের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল (যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা) এবং ঢাকা বিভাগের অংশ বিশেষ (টঙ্গী, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, গোপালগঞ্জ)।
২. মৃদু খর পানির অঞ্চল ঃ ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, পটুয়াখালী, অঞ্চলের কিছু কিছু অংশ।

মাছচাষে খরতার প্রভাব

মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য হালকা খর পানি সবচেয়ে ভাল। খরতার মান ২০ পিপিএম- এর কম অথবা বেশি হলে -

- পানির বাফারিং ক্ষমতা কমে যায়, ফলে পিএইচ দ্রুত ওঠানামা করে।
- পুকুরে সার দিলে তা কার্যকর হয় না

- ক্ষারত্ব বেড়ে গেলে (>৩০০ মি.গ্রাম/লিটার) পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদন হ্রাস পায়। কারণ তখন সালোকসংশ্লে-ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ঘাটতি হয়।
- মাছ সহজেই অম্লতা ও অন্যান্য ধাতুর বিষক্রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়।

ক্ষারত্ব ও খরতা নিয়ন্ত্রণ

- পুকুরে নিয়মিত চুন, ডলোমাইট অথবা জিপসাম প্রয়োগ করলে ক্ষারত্ব ও খরতা বৃদ্ধি পায়।
- নতুন মিঠে পানি সরবরাহ করলে ক্ষারত্ব ও খরতা হ্রাস পায়।

দূষক (Pollutants)

পারিবেশিক প্রভাবগুলোর মধ্যে দূষক অত্যন্ত মারাত্মকভাবে সকল শ্রেণীর মাছসহ জলজ প্রাণীর ক্ষতি সাধন করে এবং পরিশেষে মাছের মৃত্যু ঘটে। এমনকি দূষণের ফলে ১০০% মাছ মারা যেতে পারে। নানা ধরনের দূষক হতে পারে এবং সে অনুযায়ী মাছের ওপর প্রভাবও বিভিন্ন হতে পারে। জাতিসংঘের পরিবেশ রক্ষা এজেন্সীর (EPA) পরামর্শ অনুযায়ী ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, তামা, সীসা এবং জিংক এর নিরাপদ মাত্রা যথাক্রমে ১০, ১০০, ২৫, ১০০ এবং ১০০ মাইক্রোগ্রাম/লিটার। এসব ধাতু খাদ্যদ্রব্যে ১০ মাইক্রোগ্রাম/লিটারের অধিক হওয়া ঠিক নয়। বিষ জাতীয় দ্রব্য বিশেষ করে কৃষিতে ব্যবহৃত কীটনাশক, শত্রুতামূলক বিষ প্রয়োগ, কারখানা থেকে নিঃসৃত বর্জ্য, পোড়া তেল, ভারী ধাতব বস্তু, পয়:নর্দমা বাহিত ময়লা ইত্যাদি পুকুর বা নদীতে অন্য কোন জলাশয়ে পড়লে পানি দূষিত হয় এবং এ দূষণের ফলে মাছের মৃত্যু ঘটে অথবা পরোক্ষভাবে মাছের উৎপাদন হ্রাস পায়, রোগ জীবাণুর আক্রমণ সহজ হয়।

দূষক নিয়ন্ত্রণ

- পুকুরে ভাল উৎস থেকে নেয়া পানি ব্যবহার করা
- পাড় বা বাঁধ দিয়ে বাইরের দূষক প্রবেশ বন্ধ করা।
- কৃষিতে পরিবেশ বান্ধব বালাইনাশক পরিমাণমত ব্যবহার করা
- শিল্প বর্জ্য যত্রতত্র নিক্ষেপ (Dumping) না করা, বরং তা নিষ্ক্রীয়করণ প্লান্ট (treatment plant) স্থাপন বাধ্যতামূলক করা।
- পাহাড়া দেয়া ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

একটি আদর্শ পুকুরের পানির গুণাগুণ

গুনাগুনের নাম	অনুকূল মাত্রা
গভীরতা	২ মিটার
স্বচ্ছতা	২৫-৩০ সেন্টিমিটার
তাপমাত্রা	২৫°-৩০° সেন্টিগ্রেড
দ্রবীভূত অক্সিজেন	৫-৮ পিপিএম
দ্রবীভূত কার্বন ডাই অক্সাইড	১-২ পিপিএম
পিএইচ	৭.৫-৮.৫
ক্ষারত্ব	১০০ পিপিএম
ফসফরাস	০.৫-১.০ পিপিএম
নাইট্রোজেন	২-৪ পিপিএম

পুকুরের মাটির গুণাগুণ

মাছ চাষের উপযুক্ত উর্বর মাটি

মাছ জলজ প্রাণী। মাছের জীবন যাপনের জন্য পানি অপরিহার্য। আর জলাশয়ের পানি ধারণের আধার হচ্ছে মাটি। মাটির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ দ্বারা পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ প্রভাবিত হয়। উর্বর মাটিতে খননকৃত পুকুরের পানিও উর্বর হয়ে থাকে। কারণ মাটিতে বিদ্যমান খনিজ পদার্থসমূহ পুকুর বা জলাশয়ের পানির উৎপাদনশীলতা নিয়ন্ত্রণ করে। এ পানি থেকেই মাছ তার জীবন ধারণের যাবতীয় পুষ্টি উপাদান বা খাদ্য গ্রহণ করে থাকে।

বাংলাদেশের মাটির ধরণ

বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই বিভিন্ন ধরণের মাটির পুকুরে বা জলাশয়ে মাছ চাষ করা হয়। কিন্তু এসব পুকুর বা জলাশয়ের উৎপাদনশীলতা বা উর্বরতা এক রকম নয়। ফলে এসব পুকুরে মাছের উৎপাদন বিভিন্ন পরিমাণের হয়ে থাকে। একটি পুকুরের উর্বরতা হচ্ছে পুকুরের মাটিতে মাছের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য কি পরিমাণ প্রয়োজনীয় খনিজ ও পুষ্টিকর উপাদান রয়েছে। সাধারণত স্বাস্থ্যকর জলজ পরিবেশে ও পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমিত প্রাচুর্যতার উপর লভজনকভাবে মাছ চাষ নির্ভরশীল। মাটির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ বা উর্বরতার ওপর পানির প্রাথমিক উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে।

মাটির ধরণ খামারের জন্য খুবই গুররুত্বপূর্ণ। খামার স্থাপনের পূর্বে মাটির ধরণ ও সচ্ছিদ্রতা (Porosity) বিষয়ে অবশ্যই জানতে হবে। তাত্ত্বিকভাবে যে কোন ধরণের জমিতে খামার নির্মাণ করা যায়। তবে লাভজনকভাবে মাছচাষ করতে হলে কাঁদা বা এঁটেলযুক্ত দোঁআশ মাটি খামার স্থাপনের জন্য ভাল। কারন এ ধরণের মাটির পানির ধারণ ক্ষমতা বেশি, পানি চোয়ানের রোধ করার ক্ষমতা বেশি। তাছাড়া এ ধরণের মাটিতে প্লাংকটন ও বেনথোস উৎপাদনক্ষম প্রচুর পুষ্টি বিদ্যামান থাকে। এ ধরণের মাটির আসঞ্জক (Cohesive) বৈশিষ্ট্য থাকার ফলে মাছ চাষের জন্য এ মাটি উপযোগী। এ ধরণের মাটির তল আয়তন (Surface area) খুব বেশি থাকার কারণে এরা অধিক পরিমাণে পুষ্টি উপাদান শোষণ, ধারণ এবং জৈবিক উৎপাদনের জন্য পুষ্টি উপাদান মুক্ত (Release) করতে পারে। বেলে মাটির পানির ধারণ ক্ষমতা খুবই কম এবং শুধু এঁটেল মাটির উর্বরা শক্তি খুবই কম ও পানিতে ঘোলাত্ব সৃষ্টি করে। এছাড়া অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকার জমি খামারের জন্য নির্বাচন করা উচিৎ। এতে খামারের নির্মাণ ব্যয় কম হবে এবং আবাদী জমি নষ্ট হবে না। উপরন্তু, অনাবাদী জমি চাষের আওতায় আসবে ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

আমাদের দেশে উপকূলীয় অঞ্চলের মাটি Acid sulphate প্রকৃতির হয়। এ ধরণের মাটি মিঠা পানির অঞ্চলেও দেখা যায়। এ মাটি অত্যাধিক অম্লযুক্ত বিধায় এ মাটির পুকুরে মাছ চাষ ভাল হয় না।

উর্বরতা শক্তির ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের মাটিকে অঞ্চলভিত্তিক ৬ ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ

১. লাল ও বাদামী অম্লযুক্ত এঁটেল মাটিঃ উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমি, ঢাকা জেলার লাল মাটি, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরের গড়, সিলেট, কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার কিছু অংশ।

২. চুনযুক্ত হালকা বাদামী ও গাঢ় ধূসর নদী অববাহিকার মাটিঃ যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহী, ঢাকা ও বরিশাল জেলার কিছু অংশ গঙ্গা বা পদ্মা-বিধৌত মাটি।

৩. চুনহীন ধূসর ও গাঢ় ধূসর নদী অববাহিকার মাটিঃ ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ঢাকা, রংপুর, বগুড়া, পাবনা ও ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ ব্রহ্মপুত্র নদী-বিধৌত মাটি।

৪. বালি ও পলিময় সমভূমিঃ দিনাজপুর এবং রংপুর জেলার উত্তরাংশের বিরাট এলাকা তিস্তা-মহানন্দা নদী-বাহিত মাটি।

৫. নদীর নিকটস্থ বালিময় মাটিঃ দেশের নদীর নিকটবর্তী এ ধরণের মাটিতে বালি বেশি থাকে, জৈব পদার্থের পরিমাণ কম থাকে এবং পানি ধারণ ক্ষমতাও কম।

৬. লবণাক্ত মাটিঃ বাংলাদেশের সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চলের লবণাক্ত ।মাটি

মাটির ভৌত-রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য

সাধারণত: মাছ চাষ কার্যক্রমের জন্য দো-আঁশ /পলি দো-আঁশ/ বেলে দো-আঁশ মাটিই বেশী উপযোগী। তবে এসিড সালফেট এবং কম পিএইচ সম্পন্ন মাটিতে মাছ চাষ কার্যক্রম ভাল হবে না। মাটিতে প্রধানতঃ চারটি প্রধান উপাদান থাকে। উপাদান গুলো হচ্ছে-

১. খনিজ পদার্থ - ৪৫%
২. জৈব পদার্থ - ৫%
৩. বায়ু - ২৫% ও
৪. পানি- ২৫%।

মাছ চাষের জন্য বদ্ধ জলাশয়ের পানির উপযোগিতা মাটির পিএইচ, ফসফরাস, নাইট্রোজেন, জৈব পদার্থ ইত্যাদি উপাদানের মাত্রার ওপর নির্ভরশীল। নিচে একটি আদর্শ পুকুরে মাছ চাষের জন্য মাটির ভৌত রাসায়নিক গুনাগুনের অনুকূল মাত্রা দেওয়া হলোঃ-

মাটির গুণাগুণের নাম	অনুকূল মাত্রা
মাটির গঠন	কাঁদাযুক্ত দোঁআশ বা পলিযুক্ত কাঁদা
পিএইচ	৬.৫-৭.৫
নাইট্রোজেন (মি.গ্রা/১০০গ্রাম)	৫০-৭৫
ফসফরাস (মি.গ্রা/১০০গ্রাম)	১০-১২
পটাসিয়াম (মি.গ্রা/১০০গ্রাম)	৩-৪
ক্যালশিয়াম (মি.গ্রা/১০০গ্রাম)	৪০-৫০
জৈব কার্বন (%)	১.৫-২.৫
জৈব পদার্থ (%)	২.৫-৪.৩

মাটির প্রকার ভেদ

মাটিতে বিদ্যমান খনিজ পদার্থ সমূহ পুকুর বা জলাশয়ের পানির উৎপাদনশীলতা নিয়ন্ত্রণ করে। মাছ চাষের ওপর এসব মাটির ভূমিকাও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। মাটি সাধারণত বিভিন্ন প্রকার কণার সমন্বয়ে গঠিত। এসব কণার তারতম্যের ভিত্তিতে মাটিকে ৫ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

১. পাথুরে মাটি
২. এঁটেল মাটি
৩. বেলে মাটি
৪. লাল মাটি
৫. দোঁআশ মাটি

১. **পাথুরে মাটিঃ-** এ ধরণের মাটি পাথর, বালি, নুড়ি ও কাঁকরের সমন্বয়ে গঠিত। এ মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা, শোষণ ক্ষমতা ও নমনীয়তা নাই। এর পানি নিষ্কাশন ও বায়ু চলাচল ক্ষমতা বেশি। এ মাটি মাছ চাষের অনুপযোগী।

২. **এঁটেল মাটিঃ-** এ মাটিতে শতকরা ৪০-৫০ ভাগ কর্দম রেণু বিদ্যমান থাকে। এ মাটি ভেজা অবস্থায় খুব নরম এবং শুকনো অবস্থায় খুব শক্ত হয়ে থাকে। এঁটেল মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা ও শোষণ ক্ষমতা বেশি। তবে পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা খুবই কম। এঁটেল মাটিতেও মাছ চাষ করা যায়।

৩. **বেলে মাটিঃ-** এ ধরণের মাটি শতকরা ৮০ ভাগ বা তার চেয়ে বেশি বালুকণা দিয়ে গঠিত। এ মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ খুব কম থাকে এবং স্থুল বালি কণা বিশিষ্ট। বেলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা, শোষণ ক্ষমতা ও নমনীয়তা নাই। এ মাটির পানি নিষ্কাশন ও বায়ু চলাচল ক্ষমতা বেশি। ফলে এ মাটি পানি ও পুষ্টিকর পদার্থ ধরে রাখতে পারে না। এ মাটি মাছ চাষের একেবারেই অনুপযোগী।

৪. **লাল মাটিঃ-** এ ধরণের মাটি অম্লযুক্ত এবং কাঁদা ও বালিযুক্ত কাঁদা দ্বারা গঠিত। লাল মাটিতে ক্যালসিয়াম, সহজ প্রাপ্য ফসফরাস, কর্বিন ও জৈব পদার্থের পরিমাণ খুব কম থাকে। এ ধরণের মাটির পুকুরের পানি সব সময় ঘোলা থাকে। ফলে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা খুবই কম হয়। এ কারণে লাল মাটি এলাকার পুকুর মাছ চাষের জন্য অতটা উপযোগী হয় না। এ মাটিতেও মাছ চাষ করা যায় তবে তা ব্যয় বহুল।

৫. **দোঁআশ মাটিঃ-** এ মাটি শতকরা ৫০ ভাগ বালুকণা এবং ৫০ ভাগ পলিকণা ও কর্দম কণার সংমিশ্রনে গঠিত। এ মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা এবং বায়ু চলাচল ক্ষমতা বেশি। এ মাটি মাছ চাষের জন্য খুবই উপযোগী।

মাটির গুণাগুণ

মাছ ও চিংড়ি সাধারণত পুকুরের তলদেশে উৎপাদিত প্রাকৃতিক খাদ্য খেয়ে জীবন ধারন করে থাকে এবং বেশির ভাগ সময় খামারের তলদেশের মাটির উপর অবস্থান করে। এজন্য মাটির গুনাগুনের উপর মাছ চাষ অনেকাংশে নির্ভরশীল। আবার মাটির উর্বরতা মাটির বুনট (Soil texture), মাটির কাঠামো (Soil Structure), ও মাটির স্তরবিন্যাস (Soil Layering profile)- এ তিনটি বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল। কারণ মাটির এ বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা, মাটিতে পানির অনুপ্রবেশের হার এবং পানি অনুপ্রবেশের পরে মাটির মধ্যে পানির গমনাগমন (Permeability) নির্ভর করে।

মাটির বুনট (Soil texture)

মাটির বুনট মাটির স্থূলতা বা সূক্ষ্মতার গুন প্রকাশকারী একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। মৃত্তিকা কণার বালি, পলি ও কাঁদার পারস্পরিক পরিমাণগত অনুপাত দ্বারা নির্ণীত মাটির প্রকারভেদকে মাটির বুনট বলে। বুনট অনুযায়ী মাটির ১২টি প্রকরণ পাওয়া যায়, যথা- কাঁদা (Clay), বালিযুক্ত কাঁদা (Sandy clay), পলিযুক্ত কাঁদা (Silty clay), বালি ও কাঁদাযুক্ত দোআঁশ (Sandy clay loam), কাঁদাযুক্ত দোআঁশ (Clay loam), পলি কাঁদাযুক্ত দোআঁশ (Silty clay loam), দোআঁশযুক্ত বালি (Loamy sand), বালি (Sand), বালিযুক্ত দোআঁশ (Sandy loam), দোআঁশ (Loam), পলিযুক্ত দোআঁশ (Silty loam), পলি (Silt)। *মাছ চাষের জন্য ভাল মাটি হলো কাঁদা (Clay), পলিযুক্ত কাঁদা (Silty clay), পলি কাঁদাযুক্ত দোআঁশ (Silty clay loam), দোআঁশ (Loam) এবং কাঁদাযুক্ত দোআঁশ (Clay loam)।* বালিযুক্ত দোআঁশ (Sandy loam) মাটিতে ৩০% এর কম বালি থাকলে তাও মাছচাষের জন্য উপযোগী।

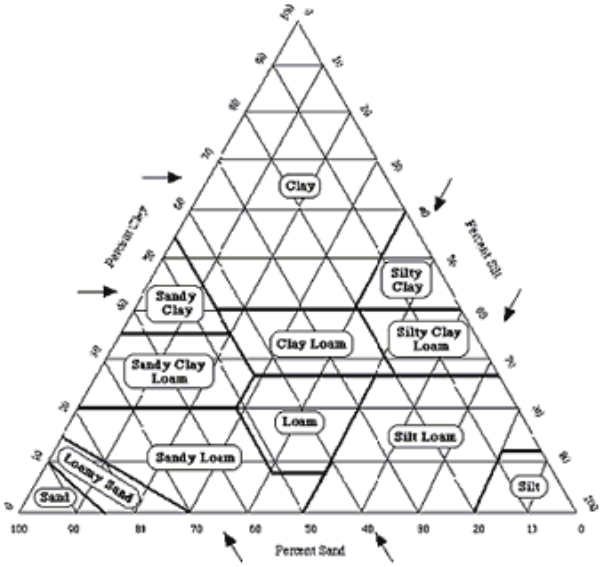

চিত্র-২: মাটির বুনট

কৃষি ব্যবহারের সুবিধার জন্য মাটির বুনট শ্রেনীকে সাধারণত ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ বেলে মাটি, দোআঁশ মাটি ও এটেল মাটি।

(ক) বেলে মাটিঃ এ মাটিতে ৮০% বা এর চেয়ে বেশি বালি কণা থাকে।

(খ) দোআঁশ মাটি ঃ এ ধরণের মাটিতে ৫০% ভাগ বালি অবশিষ্ট ৫০% ভাগ পলি ও কর্দম কণা থাকে।

(গ) এটেল মাটিঃ এ ধরণের মাটিতে ৩৫% কর্দম কণা থাকে।

মাটির কাঠামো (Soil Structure)

বালি কণা পলিকণা ও কর্দম কণা পারস্পরিকভাবে সন্নিবিষ্ট হয়ে মাটিকে যে সুনির্দিষ্ট বিন্যাস তৈরি হয় তাকে মৃত্তিকা কাঠামো বলা হয়। মাটির কাঠামো মাটিতে বায়ু চলাচল, পানির অনুপ্রবেশ ও ভূমি কণা সহজকরন কে প্রভাবিত করে থাকে। উপযুক্ত পরিচর্যা দ্বারা মাটির কাঠামোর উন্নয়ন করা যায়। এতে মাটির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে।

সাধারণত বালি, পলি ও কাঁদা কণার উপর মাটির গঠন কাঠামো নির্ভর করে। মৃত্তিকা খনিজের মধ্যে বালিকণা, পলিকণা ও কর্দমকণাকে (Soil Particle) মাটি কণা বলা হয়। সাধারণত দুই মিলিমিটারের কম ব্যস সম্পন্ন নির্দিষ্ট আকার ও মাত্রার অন্তর্ভূক্ত খনিজ কণাকে মৃত্তিকা কণা বলা হয়। মৃত্তিকা কণার আকারের উপর ভিত্তি করে বালি, পলি ও কাঁদা কণার সংজ্ঞা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

বালিকণাঃ- এ জাতীয় কণার ব্যাস ২.০-০.০৫ মি.মি.। বালি কণা দুই আঙ্গুলে ঘষলে কচকচ করে ও শক্ত মনে হয়। এ ধরণের কণা ভিজা অবস্থায় নমনীয় ও আঁঠালো হয় না।

পলিকণাঃ- পলি কণার ব্যাস ০.০৫-০.০০২ মি.মি। দুই আঙ্গুলে ঘষলে মসৃন ও ঝুরঝুরে মনে হয়। এ ধরণের কণা ভিজলে নমনীয় ও আঠালো হয় না। পলি কণার আকার বালিকণা ও কর্দম কণার মাঝামাঝি হয়ে থাকে। পলিকণা পলিমাটির কাঠামো তৈরিসহ উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান সরবরাহ কাজে অংশ গ্রহণ করে থাকে। পলিকণা মাটির অন্যান্য ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করে।

কর্দম কণাঃ- এ কণার ব্যাস ০.০০২ মি.মি. এর চেয়ে কম। মৃত্তিকা কণার মধ্যে কর্দমকণার আকার সবচেয়ে ছোট। অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে এদের দেখা যায় না। ভূমির উর্বরতায় কর্দম কণা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

মাটির স্তরবিন্যাস (Soil profile)

মাটি উপর থেকে নিচের দিকে স্তরে স্তরে সাজানো থাকে। বিভিন্ন মাটিতে এ স্তরের সংখ্যা ও তাদের গুনাবলী বিভিন্ন হয়ে থাকে। সাধারণত এ স্তরগুলোর সমন্বয়েই মাটির স্তরবিন্যাস গঠিত। মাটির স্তরের উপর নির্ভর করেই পুকুর খনন করা উচিত। বালি মাটির স্তরে এসে পুকুর খনন বন্ধ করা যাবে না। এক্ষেত্রে পুকুরের গভীরতা বালি মাটির উপরের স্তরে অথবা প্রয়োজনে নিচের স্তরে নিয়ে যেতে হবে। বালি মাটির পানি ধারন ক্ষমতা নাই বিধায় এ স্তরে পুকুর খনন করলে পুকুরে পানি ধরে রাখা যাবে না। ফলে পুকুরে পানির গভীরতা কমে যাবে।

পিএইচ (P^H)

মাটি অম্লীয় বা ক্ষারীয় কি না তা পিএইচ এর মাধ্যমে জানা যায়। ১ থেকে ১৪ সংখ্যা দ্বারা পিএইচ মান প্রকাশ করা হয়। মাটির পিএইচ এর মান ৪ এর কম এবং ১০ এর বেশি হলে সে মাটি মাছ চাষের অনুপযোগী । মাটির পিএইচ মান ৬.৫-৭.৫ হলে সে মাটি মাছ চাষের পুকুর নির্মানের জন্য সবচেয়ে ভাল। কোন মাটির পিএইচ মান ৭ এর কম হলে তাকে অম্ল মাটি এবং পিএইচ মান ৭ এর বেশি হলে তাকে ক্ষার মাটি বলে। সাধারণত মাটির পিএইচমান ৪ থেকে ১০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ মাটির পিএইচ মান ৫ থেকে ৮ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

মাটিতে উদ্ভিদ পুষ্টি সরবরাহ এবং অনুজৈবিক প্রক্রিয়ার জন্য মাটির পিএইচ মান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাটির পিএইচমান মাটির এবং মাটির থেকে বিদ্যমান পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মাটির অনুকূল পি এইচ মাত্রায় ফসফরাসের যোগান বৃদ্ধি পায় এবং অ্যামোনিয়া ও নাইট্রোজেন গঠিত অনুজীব অধিক কার্যক্ষম হয়। অপর পক্ষে পিএইচ মান ৬.০ এর নিচে হলে মাটি অধিক অম্লীয় হয় এবং পানিতে ক্ষতিকর মৌলিক পদার্থের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। অপর পক্ষে পিএইচ মান ৯.০ এর বেশি হলে অনুজীবগোষ্ঠী নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং ফসফরাসের যোগান হ্রাস পায়। ফলে পানিতে উদ্ভিদ প্লাংকটনের উৎপাদন খুব কমে যায়।

মাটিতে লোহা ও অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকায় এবং জোয়ার প্লাবিত অঞ্চলের স্থান বিশেষে মাটিতে পাইরিনেটেড সালফাইড জারনের ফলে সৃষ্ট সালফিউরিক এসিড বেশি থাকায় মাটির অম্লত্ব বেশি হয়। আর মাটিতে চুন কিংবা সোডিয়াম আয়রনের পরিমাণ বেড়ে গেলে মাটির ক্ষারত্ব বেশি হয়।

পিএইচ নিয়ন্ত্রণ

অত্যাধিক অম্লযুক্ত Acid sulphate মাটির পুকুরে মাছ চাষ ভাল হয় না বলে এ ধরণের মাটির পুকুরের তলা কংক্রিট দিয়ে বেঁধে তলায় উর্বব দোআঁশ মাটির স্তর সৃষ্টি করা ভাল। এতে প্রাথমিক খরচ বেশি হলেও দীর্ষমেয়াদী চাষের জন্য ভাল। মাটি অম্লীয় হলে তাতে চুন প্রয়োগ করে এবং ক্ষারধর্মী হলে তাতে অ্যামোনিয়াম সালফেট বা তেঁতুল গোলানো পানি প্রয়োগ করে পিএইচ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সাধারণত চুন প্রয়োগ করেই মাটির পিএইচ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অম্লীয় মাটিকে চুন প্রয়োগের দ্বারা চাষানুকূল করার পর মিঠে পানি প্রবেশ করাতে হয়। মিঠে পানির সরবরাহ বাড়ানো হলে মাটির অধিক ক্ষারত্ব বা অম্লতের যেকোন অবস্থা কমে যায়।

ফসফরাস (Phosphorous)

মাটিতে বিদ্যমান ফসফরাসের ওপর মাছের উৎপাদন সরাসরি নির্ভরশীল। তাই পুকুরের মাটিতে সামান্য মাত্রায় ফসফেট থাকা ভাল। ক্যালসিয়াম ফসফেট, আয়রন ফসফেট এবং অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট হিসেবে মাটিতে ফসফরাস অবস্থান করে। সহজপ্রাপ্য ফসফরাসের সরবরাহ অব্যাহত রাখতে মাটিতে পরিমিত পরিমাণ জৈব পদার্থ থাকা দরকার। কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জৈব এসিড ও তাদের বিভিন্ন যৌথ ক্যালসিয়াম ফসফেট এর সাথে বিক্রিয়া করে ফসফরাসের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করে। পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতাকে ফসফরাস সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সবুজ শেওলা উৎপাদনে ফসফরাস সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ফলে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদ প্লাংকটন উৎপন্ন হয়। মাছ চাষের জন্য প্রতি ১০০ গ্রাম মাটিতে ১০-১৫ মিলিগ্রাম সহজপ্রাপ্য ফসফরাস থাকা উচিত।

ফসফরাস নিয়ন্ত্রণ

পুকুরে পরিমানমত কম্পোষ্ট, টিএসপি বা ডিএপি সার প্রয়োগ করে ফসফরাসের সরবরাহ ঠিক রাখতে হয়। পুকুর প্রস্তুত কালে চুন প্রয়োগ করা হলে মাটিতে থাকা জৈবযৌগ হতে ফসফেট মুক্ত হয়ে পানিতে মিশে যায়। ফলে পানি মাছের প্রাকৃতিক খাবার ফাইটোপ্লাংকটন বৃদ্ধির অনুকূল হয়ে যায়। পুকুরে ফসফরাসের যোগান ঠিক রাখতে হলে পরিমিত কাঁদা থাকা বাঞ্চনীয়। অত্যাধিক সার বা খাদ্য প্রয়োগ করা হলে সৃষ্ট অতিরিক্ত জৈববস্তুর পঁচনের ফলে ফসফরাস বেড়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পিএইচ দেখে নিয়ে পরিমিত চুন প্রয়োগ, পরিমাণ মত সার ও খাদ্য প্রয়োগ, তলার অতিরিক্ত পঁচা কাঁদা অপসারণ করা এবং জাল বা হররা টানায় উপকার পাওয়া যায়।

নাইট্রোজেন (Nitrogen)

মাটিতে নাইট্রোজেনের প্রধান উৎস হচ্ছে বায়ুমন্ডলের নাইট্রোজেন। মাটিতে বিদ্যমান নাইট্রোজেনের বেশির ভাগ জৈব গঠনে পাওয়া যায় এবং বিছু অংশ এ্যামাইনো এসিড পেপটাইড হিসেবে সহজে পঁচনযোগ্য প্রোটিন হতে পাওয়া যায়। এছাড়া অজৈব অ্যামাইনো নাইট্রেড হিসেবে নাইট্রোজেন মাটতে পাওয়া যায়। এ নাইট্রোজেন ব্যাক্টেরিয়া ও নীলাভ সবুজ শৈবালের ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়।

ব্যাক্টেরিয়া মাটিতে বিদ্যমান জৈব পদার্থকে ভেঙ্গে অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন উৎপাদন করে। ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়ার ফলে অ্যামোনিয়া থেকে প্রথমে নাইট্রাইট এবং পরে নাইট্রেট নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ প্লাংকটন উৎপাদনে নাইট্রেট নাইট্রোজেন প্রয়োজন হয়। মাটিতে ব্যবহারযোগ্য নাইট্রোজেন (নাইট্রেট নাইট্রোজেন) বেশি থাকলে মাছের উৎপাদন ভাল হয়। প্রতি ১০০ গ্রাম মাটিতে ৫০-৭৫ মিলিগ্রাম সহজপ্রাপ্য নাইট্রোজেন থাকা দরকার।

নাইট্রোজেন নিয়ন্ত্রণ

প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন কোন বড় জলাশয়ের নাইট্রোজেন চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। তাই ইউরিয়া সার প্রয়োগ করে মাটি ও পানির নাইট্রোজেন চাহিদা মেটানো হয়। নাইট্রেজেন ফিক্সিং ব্যাকটেরিয়া (*Azotobacter, Rhizobium, Anabaena, Rhodosprillum* ইত্যাদি), নাইট্রাইটকে নাইট্রেটে রুপান্তরকারী ব্যাকটেরিয়া (*Nitrobacter)* প্রয়োগ ও ব্যবহার করে উপকারী নাইট্রেট নাইট্রোজেন বৃদ্ধি ও ক্ষতিকর নাইট্রাইট নাইট্রোজেন হ্রাস করা সম্ভব।

পটাশিয়াম (Potassium)

উদ্ভিদ প্লাংকটন উৎপাদনের জন্য মাটিতে পরিমিত পরিমাণ পটাশিয়াম থাকা দরকার। পুকুরের মাটিতে পটাশিয়ামের অভাব থাকলে মাছ চাষ ব্যহত হয়। কারণ মাছ চাষে উদ্ভিদ প্লাংকটন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। আর পটাশিয়ামের অভাবে উদ্ভিদ প্লাংকটন উৎপাদন বাধাগ্রস্থ হয়। প্রতি ১০০ গ্রাম মাটিতে ৩-৪ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম থাকা দরকার।

পটাশিয়াম নিয়ন্ত্রণ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাটিতে পটাশিয়াম পরিমিতই থাকতে দেখা যায়। পুকুরের মাটি ও পানিতে পটাশিয়ামের সরবরাহ বৃদ্ধি করতে পরিমানমত এমওপি সার সরবরাহ করতে হয়। জৈব সার বা কম্পোষ্ট প্রয়েগেও পটাশিয়ামের ঘাটতি দূর হয়।

হাইড্রোজেন সালফাইড (Hydrogen sulphide, H_2S)

ক্ষুদ্র উদ্ভিদ বা ফাইটোপ্লাংকটন (Phytoplankton) সরাসরি মাছের খাদ্য। কিন্তু এদের আধিক্য বা ব্লুম হওয়া এবং পরবর্তীতে পুকুরের তলায় এসব বস্তুর পঁচন হাইড্রোজেন সালফাইডের আধিক্য সৃষ্টি করে যা মাছের জন্য ক্ষতিকারক। পুকুরের তলদেশে গাছের পাতা, আবর্জনার পচন, অব্যবহৃত মাছের খাদ্য পঁচনের ফলে বিশেষ করে চিংড়ি চাষে কালো মাটি (Black soil) জমে গেলে হাইড্রোজেন সালফাইডের আধিক্য দেখা দিতে পারে। এর গন্ধ পঁচা ডিমের গন্ধের ন্যায়। চিংড়ি ও মাছ উভয় ক্ষেত্রেই এর পরিমাণ ০.০৩ পিপিএম এর উর্দ্ধে গেলেই তা বিষাক্ত বলে বিবেচিত হয়। পিএইচ এর মাত্রা কম থাকলে তখন এ গ্যাস আরো বিষাক্ত হয়।

হাইড্রোজেন সালফাইড নিয়ন্ত্রণ

কোনভাবেই পুকুরে অতিরিক্ত সার বা খাদ্য প্রয়োগ করা ঠিক নয়। পুকুরে কচুরীপানা, ডুবন্ত বা ভাসমান শেওলা বা উদ্ভিদ অতিরিক্ত হতে দেয়া উচিত নয়। পুকুরের তলার উপরে কাঁদাযুক্ত জারণ স্তর (oxidized layer) রাখতে হবে যেখানে জৈব বস্তুর বায়বীয় দহণের (aerobic decomposition) ফলে ক্ষতিকর পদার্থসমূহের বিপাক সম্পন্ন হবে ও তলার পরিবেশ ভাল থাকবে। এজন্য এয়ারেটরের পাইপের মাধ্যমে পুকুরের তলায় বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু পুরাতন পুকুরের তলার অতিরিক্ত পঁচা কাঁদার মোটা স্তর অপসারন করতে হবে যাতে করে অবায়বীয় দহণের (anaerobic decomposition) ফলে ক্ষতিকর গ্যাস এ্যামোনিয়া, নাইট্রাইট, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি উৎপন্ন না হয় (Blackburn, 1987)। মাঝে-মধ্যে জাল বা হররা টানা হলে হাইড্রোজেন সালফাইডের আধিক্য দূর হয়।

জৈব পদার্থ (Organic matter)

মাছ চাষের মাটিতে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ থাকা দরকার। জৈব পদার্থকে জীবনের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জৈব পদার্থ খামারের মাটিকে উন্নত করে এবং পানিভেদ্যতা হ্রাস করে। পুকুরের তলদেশের মাটিকে সজীব ও সক্রিয় রাখতে এবং মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে জৈব পদার্থের প্রয়োজন। ফসফরাস ও নাইট্রোজেনের প্রধান উৎস হচ্ছে জৈব পদার্থ। মাটিতে অতিরিক্ত মাত্রায় জৈব পদার্থ থাকলে পানির পি এইচ কমে যায় ফলে পানি দুষিত হয়ে পড়ে। আবার কখনো কখনো দূষণ দূর করার জন্য জৈব পদার্থ প্রয়োগ করা হয়। তাছাড়া খামারের মাটি এবং পানির মধ্যে খাদ্য শিকলে জৈব পদার্থ গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে থাকে। মাটিতে নাইট্রোজেন ফিক্সেশনের জন্য জৈব পদার্থ হতে প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেড সংগ্রহ হয় এবং এগুলো প্রাণী প্লাংকটনের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। খামারের মাটিতে ৫-১০% জৈব পদার্থ থাকা দরকার। যে কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মাটিতে বিদ্যমান জৈব পদার্থ একটি অপরিহার্য উপাদান। জলাশয়ের মাটিতে শতকরা ১.৫-২.৫ ভাগ জৈব কার্বন থাকলে পানির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

পুকুরের উৎপাদনশীলতায় তলার কাদার প্রভাব

পুকুরের উৎপাদনশীলতা অধিকাংশ নির্ভর করে তলদেশের মাটির ওপর। যদি অনুর্বর কৃষি জমিতে পুকুর খনন করা ক্ষেত্রেই হয় এবং বাহির থেকে কোন প্রকার পুষ্টিকারক উপাদন সরবরাহ করা না হয় তবে সেই পুকুর হবে অনুৎপাদনশীল এবং খননকৃত পুকুরটির মাটি যদি উর্বর হয় তবে সেই পুকুর হবে উৎপাদনশীল। সর্বোত্তম পুকুরের তলদেশের মাটি হচ্ছে সেই মাটি যে মাটিতে জৈব পদার্থসমূহের পচন তাড়াতাড়ি হয়ে এবং মাটি ও পানির আন্তঃক্রিয়া সার্বক্ষণিক ভাবে চলে এবং তলদেশের মাটি থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকারক পদার্থসমূহ সহজেই পানিতে মুক্ত হয়। দো-আঁশ মাটিতে সার প্রয়োগ সবচেয়ে বেশি কার্যকর। কাদা মাটি মাছ চাষের জন্য কম উপযোগী। কাদা মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি। তলদেশে কাদাযুক্ত পুকুর খুব বেশি উৎপাদনশীল। সার প্রয়োগের মাধ্যমে পুকুরে অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টিকারক পদার্থসমূহের সরবরাহের মাধ্যমে পুকুরের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং এতে করে মাছের অধিক উৎপাদনও নিশ্চিত হয়।

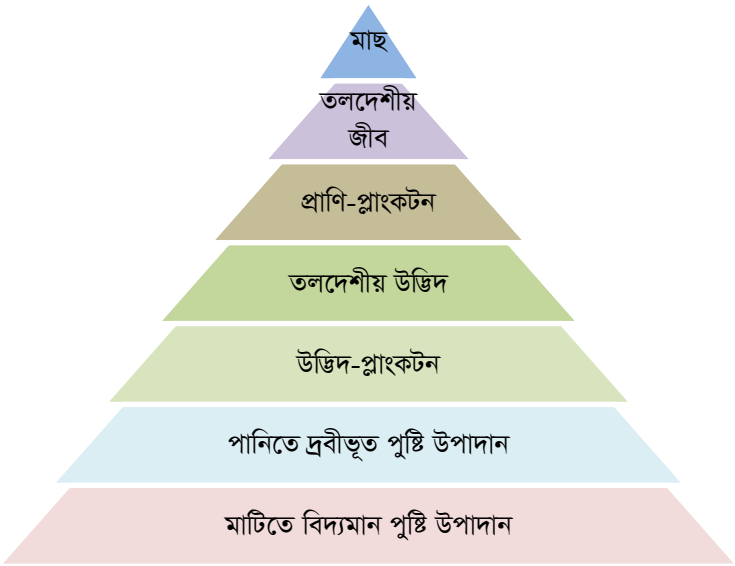

চিত্র-৩: পুকুরের খাদ্য পিরামিড

পুকুরের তলদেশীয় মাটির রাসায়নিক গুণাবলি অনেকাংশে পার্শ্ববর্তী জমির মাটির সাথে পারস্পরিকভাবে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত এবং পার্শ্ববর্তী জমি থেকে আসা পুষ্টি উপাদানের কারণে ঐ পুকুরের তলদেশের মাটিতে পুষ্টিকারক পদার্থের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। মাটিতে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদান পরবর্তীতে পানিতে দ্রবীভূত হয়। উদ্ভিদপ্লাংকটন পানির এই পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে প্রাথমিক খাদ্য তৈরি করে। মাটির পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে আরো জন্ম নেয় তলদেশীয় উদ্ভিদ। উদ্ভিদপ্লাংকটন থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে বেড়ে ওঠে প্রাণিপ্লাংকটন। উদ্ভিদপ্লাংকটন, প্রাণিপ্লাংকটন, তলদেশীয় উদ্ভিদের পঁচনের পর তা থেকে পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে তলদেশীয় নানা ব্যাকটেরিয়া ও কীটপতঙ্গ। আর এই উদ্ভিদপ্লাংকটন, প্রাণিপ্লাংকটন, তলদেশীয় উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি থেকে পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে বেড়ে ওঠে মাছ। এভাবেই মাটির পুষ্টি উপাদান মাছ উৎপাদনে ভূমিকা রাখে (চিত্র-৩)।

জৈব পদার্থ নিয়ন্ত্রণ

পুকুরে পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ না থাকলে বা কম থাকলে পুকুর পুষ্টি উপাদানের অভাবে অনুর্বর হয় বলে জৈব সার ও কম্পোষ্ট প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু পুকুরের তলায় অতিরিক্ত পঁচা কাঁদার মোটা স্তর থাকলে তা পুকুর প্রস্তুতকালে অপসারন করতে হবে এবং পুকুর ভালভাবে রৌদ্রে শুকিয়ে, তলায় চাষদিয়ে (Tilling) ও চুনপ্রয়োগ করে মাটি শোধন করতে হবে। চাষকালে মাঝে-মধ্যে জাল বা হররা টানা হলে অবায়বীয় দহণের (anaerobic decomposition) ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকর গ্যাসের আধিক্য দূর হয়।

References:

1. Claude E. Boyd,Department of Fisheries and Allied Aquacultures Auburn University, Alabama; C.W. Wood, Department of Agronomy and Soils, Auburn University, Alabama;Taworn Thunjai, Department of Fisheries and Allied Aquacultures, Auburn University, Alabama (2002) *AQUACULTURE POND BOTTOM SOIL QUALITY MANAGEMENT*
2. Howerton, Robert (2001) *Best Management Practices for Hawaiian Aquaculture*, Center for Tropical Aquaculture Publication No. 148
3. Summerfelt, Robert C. (n.d.) *Water Quality Considerations for Aquaculture*, Aquaculture Network Information Center (http://aquanics.org)
4. Swann, LaDon (n.d.) *A Fish Farmer's Guide to Understanding Water Quality*, Aquaculture Network Information Center (http://aquanics.org)
5. Watson , Craig A. and Shireman, Jerome V. (1996) *Production of Ornamental Aquarium Fish*, Department of Fisheries and Aquatic Sciences: Document FA-35
6. Boyd, C.E. (1990). Water Quality in Ponds for Aquaculture. Birmingham Publishing Company,Birmingham, Alabama.
7. Boyd, C.E. (1998). Water Quality for Pond Aquaculture. Research and Development Series No. 43.International Center for Aquaculture and Aquatic Environments, Alabama Agricultural Experiment Station, Auburn University, Alabama.
8. Ingram, B.A., Hawking, J.H. Shiel, R.J. (1997). Aquatic Life in Freshwater Ponds; A guide to the identification and ecology of life in aquaculture ponds and farm dams in South-Eastern Australia.Co-operative Research Centre for Freshwater Ecology, Albury, NSW, Australia.
9. Walker, T. (1994). Pond Water Quality Management: A Farmer's Handbook. Turtle Press Pty Ltd, Tas, Australia.
10. Ahmad M.N.U. Akanda, S.I. Hashem, M.A, Miah, M.M.A (2005). Proshikkhon Manual Moulik Machchas Bishoyk Course (Training Manual on Fundamentals of Fish culture Course), Department of Fisheries, Ramna, Dhaka, Bangladesh.
11. কাদির, এম, মঞ্জুর (২০১০), মৎস্য চাষ প্রকৌশল-২, মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়ন প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, রমনা, ঢাকা।
12. ইসলাম, এম, নজরুল (২০১০), নার্সারী ব্যবস্থাপনা, মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়ন প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, রমনা, ঢাকা।